36

আজকের কাগজ

তারিখ ... 05 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সাক্ষরতা পদ্ধতি

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

সাক্ষরতার প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের চোখের সামনে বর্ণমালার ছবি ভেসে ওঠে। বাংলা ভাষার ৫০টি বর্ণ, ১৩টি চিহ্ন ও ফলা এবং নানান ধরনের যুক্ত বর্ণকে আবর্ত করেই আমাদের সাক্ষরতা। বর্ণমালা দিয়ে শুরু করে সাক্ষরতা অর্জনের একটা সহজাত প্রবণতা আমাদের মধ্যে কাজ করে। তাও আবার ধারাবাহিকভাবে অ, আ, থেকে শুরু ঃ অতঃপর আ-কার, ই-কার, উ-কার, য-ফলা, রেফ, ঋ-কার ইত্যাদির পালা। যুক্তবর্ণের সাথে পরিচিতি সে তো আরো পরে। শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এসব বর্ণ, চিহ্ন আর 'কার' আয়ত্ত করানোর সেই গতানুগতিক পদ্ধতি এখনও আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে বিদ্যমান আছে। সাক্ষরতার জন্যে বর্ণমালা যে শিখতেই হবে কেউই সে বিষয় দ্বিমত পোষণ করেন না। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে হাতে খড়ি কি খুবই অপরিহার্য? যদি না হয় তবে বর্ণমালা আর বর্ণমালা কেন্দ্রিক চিহ্নের মত অপরিচিত জিনিসগুলোকে শিক্ষার্থীর স্মৃতির মধ্যে ঠেসে দেয়ার এত চেষ্টা কেন? সত্যি বলতে কি, বর্ণমালা আয়ত্ত করা হচ্ছে যাবতীয় শিখনের মধ্যে অন্যতম একটি কঠিন কাজ। বর্ণমালা শেখার মানেই হচ্ছে লিখতে এবং পড়তে পারা। এ কাজটিকে আকর্ষণীয় পন্থায় করাতে ব্যর্থ হলে তা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের একটি বড় কারণ হচ্ছে- গতানুগতিকভাবে বর্ণমালা শেখানোর প্রচেষ্টা। যে বয়সে শিশু তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন কিছুতে অনীহা প্রকাশ করে, সেই বয়সেই বর্ণমালা আয়ত্ত করার মত কঠিন বিষয়ের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। অভিভাবকের বকাঝকা, শিক্ষকের শাসানিসহ একটা আতঙ্কিত পরিবেশে শিশু সাক্ষরতার জগতে প্রবেশ করে। সম্পন্ন পরিবারের শিশুদের পিতামাতা ঐ সময় বাড়িতেও লেখাপড়ার যথেষ্ট আয়োজন করেন। কিন্তু দরিদ্র মানুষের সন্তানের বেলায় কি ঘটে? এদের অনেকেই দু-তিন বছর বিদ্যালয়ে টেকে। কিন্তু এক সময় দেখা যায় বর্ণমালা মুখস্থ বলা ও লেখা ছাড়া তার আর কোন পুঁজি নেই। সে স্বাধীনভাবে কোন শব্দ পড়তে বা লিখতে পারছে না। দরিদ্র পিতামাতা তখন মনে করতে বাধ্য হন, আসলে এই শিক্ষা তাদের জন্যে নয়। এমনিভাবে শিশুর বিদ্যালয়ে না আসার ইচ্ছার কাছে অভিভাবকও আত্মসমর্পণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সাক্ষরতার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। আসলে কি এটা ঝরে পড়া না সমাজের বিত্তহীন শ্রেণীর জন্যে শিক্ষা সংকোচনের ব্যবস্থা? বর্ণমালা দিয়ে শিক্ষার হাতে খড়ি শুরু হয়েছে বহুকাল আগে। তখন শিক্ষার উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় মানুষের সন্তানকে অভিজাত হিসেবে গড়ে তোলা। সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষার দ্বার তখন উন্মুক্ত ছিল না। একজন শিক্ষক অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিবিষ্ট মনে পড়াতেন। শিক্ষার্থীও গভীর অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়নে মনোযোগী হত। লেখাপড়া শেখানোর জন্যে বেতের ব্যবহারে কোন বাধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও যারা লেখাপড়া শুরু করত তাদের অধিকাংশই মাঝপথে বাদ পড়ত। শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর সর্বত্রই এক সময় এই অবস্থা বিরাজমান ছিল।

উন্নত দেশগুলোতে প্রায় শত বছর আগে সর্বসাধারণের সন্তানদের জন্যে শিক্ষার আয়োজন শুরু হয়। এজন্যে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির বদলে ধ্বনি পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হয়। ধ্বনি পদ্ধতিতে কোন বর্ণের প্রচলিত নাম না শিখিয়ে তার উচ্চারণ

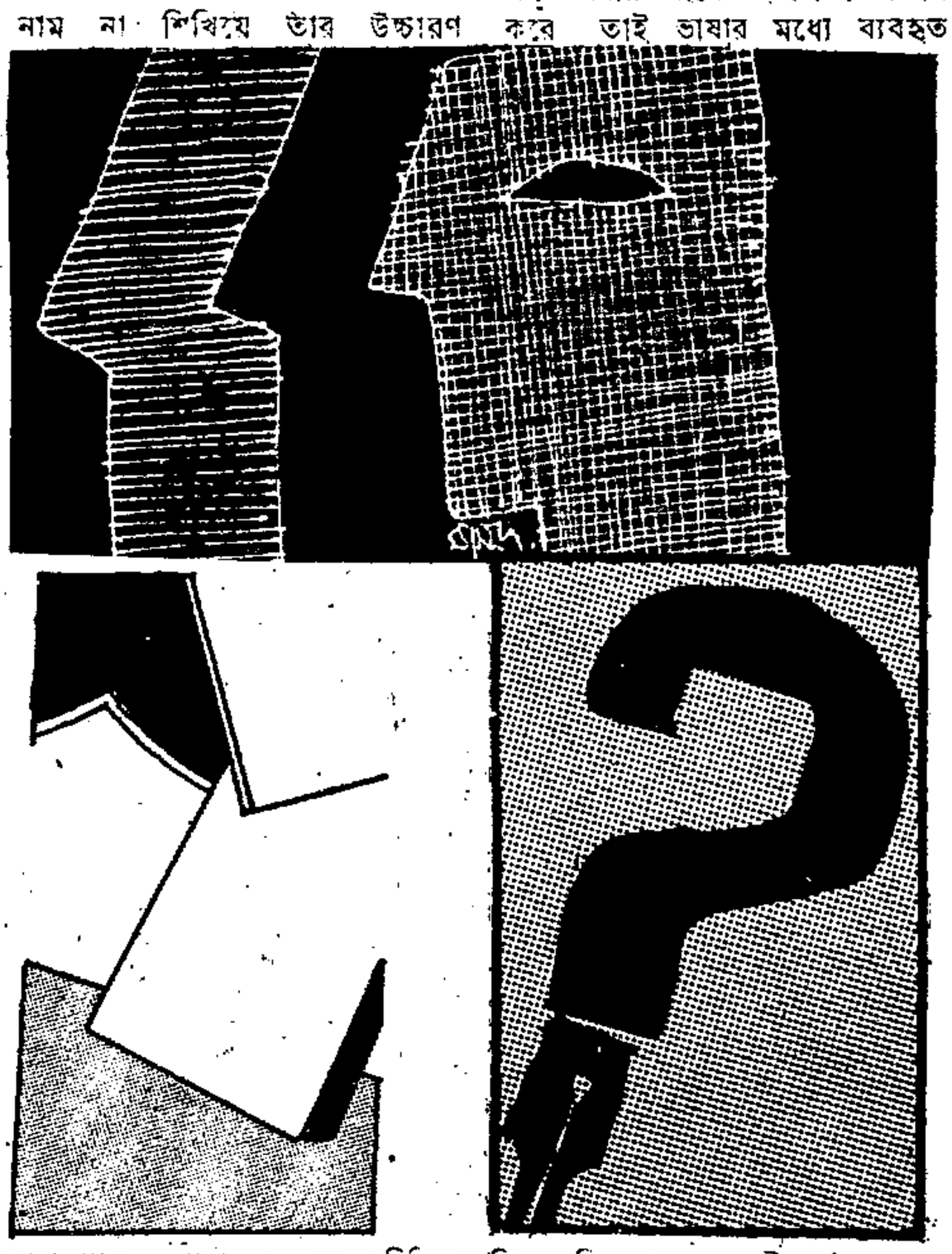

শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। অপরিচিত বর্ণের নামের চেয়ে তার ধ্বনি শিক্ষার্থীর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। এই ধ্বনি পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে ছবির সাহায্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিশু শিক্ষার্থীর কাছে ছবি এবং ধ্বনির মিশ্রণ বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এরপরে আসে শব্দ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর পরিচিত শব্দকে দেখা এবং শোনার মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন শিশু দেখামাত্র শব্দটি বলতে পারে। শব্দটির অবয়ব চিনতে পারার পর এর অন্তর্নিহিত শব্দাংশ এবং বর্ণের সাথে শিশু পরিচিত হয়। শব্দ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান শিশুর মধ্যে ভীতির অবসান ঘটায়। শিক্ষাতত্ত্ববিদরা সাক্ষরতা শিক্ষাদানের পদ্ধতি উদ্ভাবনে এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাক্যের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর সূচনাকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর বলে প্রমাণিত করেন। বাক্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে ছবি বা আলোচনার মাধ্যমে একটি বাক্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থিত করা হয়। বাক্যের অন্তস্থ শব্দ এবং বর্ণের সাথে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থী পরিচিত হয়।

পরবর্তীতে সাক্ষরতা শিক্ষাদানের জন্যে আরও কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে ভাষা পদ্ধতি অন্যতম। ভাষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাকে লিখিতরূপে তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থী এই ভাষার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাই ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু শব্দ তার দৃষ্টায়ত্তের মধ্যে চলে আসে। এরপর বর্ণের সাথেও শিক্ষার্থী পরিচিত হয়।

সাক্ষরতা পদ্ধতির সর্বশেষ উদ্ভাবন হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতির ভাল দিকগুলোকে জড়ো করে একটি সংমিশ্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ধ্বনি, ছবি, শব্দ, শব্দাংশ এবং ভাষা পদ্ধতির বিশেষ দিকগুলোকে সমন্বিত করা হয়েছে। সাক্ষরতা পদ্ধতির সর্বশেষ এই রূপটির কার্যকারিতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশে ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের বিস্তৃতির সংগে সংগে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও আধুনিক পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। এ সময় বর্ণমালা পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে বাক্য ও শব্দ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে বইপত্র তৈরি করা হয়। বইপত্র প্রণয়নের সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ অনুসরণ করা হচ্ছে না। শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত বইপত্রের মধ্যে চার দশক যাবত আধুনিক পদ্ধতির প্রতিফলন থাকলেও শিক্ষাদানের সময় গতানুগতিক বর্ণমালা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষাগ্রহণে নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ষাটের দশক থেকে যেসব উন্নত পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে, দুই দশকের মধ্যেই তা অনেক সংহত হয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যেই কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত জাতের গবাদি পশু হাঁস-মুরগির বিস্তৃতি হয়েছে। মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন হয়েছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। কিন্তু উন্নত সাক্ষরতা পদ্ধতির বাস্তবায়ন হয়েছে খুব সামান্য। এখনও দেশের শতকরা ৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি দ্বারা শিশুকে শিক্ষাদান শুরু করা হয়। এক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। শিক্ষক অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা বেশি। উন্নত পদ্ধতির সফলতার কার্যকরণ বুঝতে শিক্ষকরা সক্ষম নন ইত্যাদি।

কিভাবে গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়?

সাক্ষরতা কোর্স পরিচালনাকারী সেবক-সেবিকাগণ নিজেরাও বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছেন। কাজেই এই পদ্ধতির প্রতি তাদের দুর্বলতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে উন্নত পদ্ধতির যথার্থতা সম্বন্ধে তাদেরকে সন্দেহমুক্ত করতে হবে। অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগেও তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতা এবং এর সাথে শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ সৃষ্টির কারণগুলো সেবক-সেবিকাদেরকে নিজ থেকে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্ণের প্রচলিত নাম যথাঃ বর্গীয়, দন্ত, অন্তস্থ, কার, ফলা ইত্যাদি শুধুমাত্র উচ্চতর ব্যাকরণের বিষয়। শব্দ লেখা বা পড়ায় এসবের কোন ভূমিকাই নেই। তাই মৌলিক সাক্ষরতাকালীন সময়ে এসব বাদ দিয়েই শিক্ষাদান পরিচালনার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহ বাক্য এবং শব্দ পদ্ধতির মাধ্যমেই সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে স্বল্প লেখাপড়া জানা সেবক-সেবিকাও খুব ভালভাবে পরিচালনা করতে পারেন। ছয় থেকে নয় মাস সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরাও পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করতে পারেন।

এখন আর মুষ্টিমেয় লোকের সন্তানের জন্যে সাক্ষরতার বিষয়কে ভাবলে না। দেশের সকল শিশুর জন্যে শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাই শিক্ষা উপকরণে আধুনিক পদ্ধতির যে প্রতিফলন আছে শিক্ষাদানের বেলায়ও তার ছাপ রাখতে হবে। আমাদের শিক্ষা উপকরণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্যে আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুকে স্থান দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের দ্বার সব শিশুর জন্যে উন্মুক্ত করতে হবে। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা সম্মানজনক সাক্ষরতা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারব।